সমকালের আয়নায় পুরান ঢাকা

দেড়শ' বছরের বিদ্যাপীঠ

কে. এল. জুবিলী স্কুল ও কলেজ

■ সাজিদা ইসলাম পারুল

দেড়শ' বছরের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ কে. এল. জুবিলী স্কুল ও কলেজ। ১৯৪১ সালে এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে ছোট লাট কারমাইকেল উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'আমার পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়গুলোর মাঝে জুবিলী বিদ্যালয় বৃহত্তম।' ব্রাহ্ম আন্দোলনের জোয়ার যখন ঢাকা শহরকে আন্দোলিত করে, ঠিক তখনই বিশিষ্ট সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী অনাথ বন্ধু মল্লিক, ব্রজসুন্দর মিত্র ও দীননাথ সেন ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ঢাকা ব্রাহ্ম স্কুল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করার পর পর্তুগিজদের নীলকুঠি ভবনে ঢাকা ব্রাহ্ম স্কুলের কার্যক্রম শুরু হয়। বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তরকূলে পুরান ঢাকার বাংলাবাজারে নর্থব্রুক হল রোডের পূর্ব পাশেই এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৭

অবশ্য আরও অনেক ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্ত রয়েছে স্কুলটির। এক সময় স্কুলটি আর্থিক সংকটে পড়লে ১৮৭২ সালে বালিয়াটির জমিদার কিশোরী লাল রায় চৌধুরী এটি পরিচালনার দায়িত্ব নেন। ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

দেড়শ' বছরের বিদ্যাপীঠ

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

তখন তিনি এর নামকরণ করেন 'জগন্নাথ স্কুল'। ১৮৮৪ সালে কলেজ খোলার অনুমতি পাওয়ার পর জগন্নাথ স্কুল ও কলেজ একই কেন্দ্রীয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতে থাকে। ১৮৮৪ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনে আরোহন উপলক্ষে স্কুল ও কলেজ দুটি আলাদা হয়। কলেজটির নামকরণ করা হয় জগন্নাথ কলেজ, বর্তমানে যা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। স্কুলটির নাম বদলে রাখা হয় কিশোরী লাল জুবিলী স্কুল, যা সংক্ষেপে কে. এল. জুবিলী স্কুল। প্রতিষ্ঠার প্রায় শতবর্ষ পরে প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রয়াত মো. কামরুজ্জামানের উদ্যোগে ১৯৬১ সালে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের জন্য প্রাতঃশাখা খোলা হয়। তারই নেতৃত্বে ১৯৮০ সালে মাধ্যমিক শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রাতঃশাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ সালে কলেজ শাখা প্রতিষ্ঠার পর নবরূপে আত্মপ্রকাশ করে কে. এল. জুবিলী স্কুল ও কলেজ হিসেবে।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা যায়, প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত বিশ্বেশ্বর ব্যানার্জী, ১৯১৩-১৯৪২ সাল পর্যন্ত বিনোদ বিহারী ব্যানার্জী, ১৯৪২-১৯৫১ পর্যন্ত গোপাল চন্দ্র সেন, ১৯৫১-১৯৫৮ পর্যন্ত মীর আব্দুল গফুর, ১৯৫৮-১৯৫৯ পর্যন্ত মো. সালেম ও ১৯৫৯-১৯৮৬ সাল পর্যন্ত মো. কামরুজ্জামান প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তবে মো. কামরুজ্জামান ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের আধুনিকায়নের মূল রূপকার। তিনিই ১৯৮৬-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে ১৯৯৮-১৯৯৯ সাল পর্যন্ত শামীম আক্তার ও ১৯৯৯ সালে তিন মাসের জন্য উইং কমান্ডার (অব.) ড. এম. বাবর আলী অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও পরে তারা চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন। তখন এক অস্থিতিশীল পরিবেশের মধ্য দিয়ে স্কুল ও কলেজের কার্যক্রম চলত। ওই সময় লেখাপড়ার মান অনেকটাই কমে যায়। প্রাচীন এই বিদ্যাপীঠের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য তৎকালীন সময়ে এক জরুরি সভার মাধ্যমে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত সমরেন্দ্র নাথ রায় সমর ও ২০০০ সালের জুন-অক্টোবর পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নূরজাহান বেগম। একই বছরের ১৮ অক্টোবর থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ইস্রাফিল মিয়া। ২০০৭ সালে আবারও প্রতিষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন সমরেন্দ্র নাথ রায় সমর। ২০০৯ সালে তিনিই অধ্যক্ষ হন। তিনি বলেন, 'প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিই। এর অন্যতম কারণ ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যাপীঠের উন্নয়ন ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা। তবে এ ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ, শিক্ষকসহ অনেক প্রাক্তন শিক্ষার্থীর সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।' তিনি আরও বলেন, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা পড়াশোনা করছে। ফলে আমরা চাইলেই বেতন বাড়াতে পারি না। স্বল্প খরচে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সুযোগ দেওয়া হয়। বিনা খরচেও পড়ছে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী।

স্বল্প বেতনে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পাওয়ায় বুড়িগঙ্গার অপর তীরের জিঞ্জিরাসহ আশপাশের এলাকার ছেলেমেয়েরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে। ফলে দিনে দিনে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এ ছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখাসহ কারিগরি শাখা চালু করায় বহুমুখী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। জিঞ্জিরা থেকে নদী পাড়ি দিয়ে প্রতিদিন এই প্রতিষ্ঠানে আসেন একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী মোহনা আক্তার, নাসরীন, মলি, রিমি ও নূরজাহান। তারা বলেন, এই কলেজের পড়ার মান ভালো। প্রতিদিন ক্লাসে থাকতে হয়। নয়তো জরিমানা করা হয়। পরীক্ষায়ও ভালো ফলাফল না করলে জবাবদিহি করতে হয়।

বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে চার হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। প্রভাতী ও দিবা শাখাসহ বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক রয়েছেন ১১৩ জন। কর্মচারী ৩০ জন। এমপিওভুক্ত করা হয়েছে স্কুল ও কলেজ মিলিয়ে মাত্র ৫২ শিক্ষককে। অথচ প্রতি মাসে শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন বাবদ খরচ হয় প্রায় ২৩ লাখ টাকা। অন্যান্য খরচ তো আছেই। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বেতনের টাকার পরিমাণও অনেক কম হওয়ায় প্রতি মাসেই ভর্তুকি গুনতে হয়। এ প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির সহকারী প্রধান শিক্ষক শাহিদা বেগম বলেন, ১৮৬৬ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা পালন করে আসছে। এখনও শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া বন্ধ করতে স্বল্প বেতনে পড়ানো হচ্ছে। চার হাজার শিক্ষার্থীর জন্য আমাদের শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। অথচ এমপিওভুক্ত না করায় বিদ্যালয়ের অর্থায়নে শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে।

দিবা শাখার সহকারী প্রধান শিক্ষক সেলিম জাহাঙ্গীর আলম বলেন, এমপিওভুক্ত যেমন করেনি, তেমনি স্কুল ও কলেজ মিলিয়ে অনুমোদনও দেয়নি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অথচ অনুমোদনের জন্য ২০১০ সাল থেকে আমরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়েছি। শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য আমাদের এ বিষয়গুলোর ওপর সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন।

ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যাপীঠ থেকে বিজ্ঞানী ড. মেঘনাথ সাহা, রায় বাহাদুর ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, ড. নবগোপাল দাস, ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী সাঁতারু ব্রজেন দাস, শিল্পপতি মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আবুল হোসেন সিদ্দিকসহ অনেক প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব বের হয়েছেন।

বিশাল জায়গাজুড়ে অবস্থিত কে. এল. জুবিলী স্কুল ও কলেজের মাঠের মাঝপ্রান্তে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ স্মরণে তৈরি করা হয়েছে দেয়ালচিত্র। কলেজের প্রবেশের আরেকটি ফটক পেরিয়ে দেখা যায়, দেয়ালজুড়ে আঁকা বাংলাদেশের মানচিত্র। শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে এ যেন এক ভিন্ন আমেজ তৈরি করেছে কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া দ্বিতল ও ত্রিতলবিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনের দোতলায় রয়েছে পরিচালনা পর্ষদসহ শিক্ষকদের জন্য সভাকক্ষ। মাঠের পূর্বদিকে রয়েছে আধুনিক মিলনায়তন। দক্ষিণের ভবনের দোতলায় রয়েছে ড. মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞানাগার। প্রশাসনিক ভবনের পাশে নির্মাণ করা হয়েছে শিক্ষকদের জন্য অত্যাধুনিক আবাসিক ভবন শিক্ষক টাওয়ার। এরই মধ্যে এ প্রতিষ্ঠানের একটি দ্বিতল ভবন জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্র ও আওয়ামী লীগের সূত্রাপুর থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক গাজী আবু সাঈদ বলেন, এই বিদ্যাপীঠ থেকে এসএসসি করেছি। পরে এই জুবিলীর স্মৃতিবিজড়িত জগন্নাথ কলেজ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স করেছি। আমার শিক্ষা জীবন এই প্রতিষ্ঠান ঘিরেই। আগের শিক্ষার মান আর বর্তমানের মানে অনেক পার্থক্য আছে। তারপরও আমাদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করছি। পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও ৪৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. জাকির হোসেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলেন, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দিতে আমরা বিভিন্নমুখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। প্রতি মাসেই শিক্ষকদের সঙ্গে সভা করছি।

সংশোধনী : 'হারানো গৌরব ফিরছে' শিরোনামে গত ৭ ফেব্রুয়ারি দৈনিক সমকালে মনিজা রহমান গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে অনিচ্ছাকৃতভাবে দুটি ভুল থেকে যাওয়ায় আমরা দুঃখিত। প্রতিষ্ঠানের নাম মনিজা রহমান গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হলেন ড. খোদেজা বেগম। ২০১০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি উন্নীত হয়।